শ্রমিকশ্রেণী এখন : পরিযায়ী শ্রমিক ও দেশ

দেশে এখন কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা লাখ লাখ শ্রমিকের দায়-দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে চাপান-উতোর চলছে তা শুধুই অমানবিক নয়, ভারতের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাকেও এতে অস্বীকার করা হচ্ছে। দু'একটি রাজ্য সরকারের কিছু সদর্থক প্রচেষ্টা বাদ দিলে বেশীরভাগ রাজ্যই এই সংকটকালে শ্রমিকস্বার্থে কোনোরকম ভূমিকা নিচ্ছে না।

অতিমারী বা মহামারী চলাকালীন সময়ে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়িত করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রোটোকল মেনে চিকিৎসা শুধু নয় – কোনও রাজ্যে সবুজ-কমলা-লাল বা অতি বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা থেকে শুরু করে রাজ্যের সিদ্ধান্তে খোলা রাখা বই-এর দোকান বা রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়া – এ সবই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের 'রাজ্য নিতে চাইছে না' বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় কি? হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে কোনো কোনো রাজ্য সরকার মনে করছে যে শ্রমিকদের স্থানান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস-ও ছড়াবে, তাই যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ২৭ মার্চ একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি নেবেন না, শ্রমিকদের রাজ্যের সীমান্তেই আটকে দেবেন। এসব বক্তব্য রাজ্যবাসীরা জানেন। কিন্তু কেন্দ্রের সরকার যখন চার ঘন্টার নোটিশে লকডাউন করেছেন সারা দেশ জুড়ে তাঁরা কেন ভাবেননি এইসব মানুষদের কথা! ২২ মার্চ যখন 'জনতা কার্ফু' ঘোষণা হল তখনও তো প্রধানমন্ত্রী জানতেন যে 'লকডাউন' আসন্ন – তখনও কেন সরকার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কোনো সংস্থান বা তাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করেননি?

সংবিধানের ২১ নং এবং ৩৯নং ধারায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা দেওয়া। পরিযায়ী শ্রমিকদেরও সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতায় ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রাপ্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে। কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারেরই কোনো অজুহাতে এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেই উচিৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিপর্যয় চলাকালীন এই সময়ে। তাহলে কেন ' রাজ্য সরকার ট্রেন আসতে দিচ্ছে না' এবং ইত্যাদি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের চিঠি চালাচালি, বাক্‌বিতণ্ডা, চাপান-উতোর চলছে তো চলছেই! যতোই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হোক – শ্রম অধিকার সাংবিধানিকগত ভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের যৌথ দায়িত্ব। এটা কি অসম্ভব ছিল রাজ্যে রাজ্যে আটকে পড়া কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিক যে যেখানে রয়েছেন সেখানেই তাদের জন্য খাদ্য-বাসস্থান-চিকিৎসা-অর্থ এসবের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের কোনোরকম কষ্টের মধ্যে না পড়তে হয়! অজস্র অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে সারা দেশ জুড়ে যে তাদের প্রতি ন্যূনতম মানবিক ব্যবহারও করা হয়নি বা হচ্ছে না! তাই তারা নিতান্ত বাধ্য হয়ে শ'য়ে শ'য়ে মাইল পায়ে হেঁটে নিজ ভূমে, চেনা পরিবেশে ফিরতে চেয়েছেন বেঁচে থাকার তাগিদে।

সম্প্রতি জানা গেছে ৯৬ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই সরকার প্রতিশ্রুত কোনো রেশন পাননি। আর মালিকের কাছ থেকে বেতন পাননি ৯০ শতাংশ শ্রমিক, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস ছিল।

The WIRE -এ প্রকাশিত তেজেশ জি এন, কণিকা শর্মা ও আমান -এর করা এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে ৯মে ২০২০ পর্যন্ত ৩৭৮ জন শ্রমিক মারা গেছেন লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে যাদের কেউই করোনা আক্রান্ত হননি। এই একই লিস্ট আপডেট করা হয়েছে ১৪মে, ২০২০ যেখানে করোনা ছাড়া অন্য কারণে মৃত্যুর সংখ্যা এরকম :

অনাহার ও আর্থিক অসহায়তায়	-	৫৮
পথ হাঁটা এবং লাইনে দাঁড়ানোর ক্লান্তিতে	-	২৯
পুলিশি বর্বরতা এবং রাষ্ট্রীয় পীড়নে	-	১২
বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষজন সময়মত চিকিৎসা না পেয়ে	-	৪২
অজানা অসুখের (করোনার) ভয়ে, অসহায়ত্বে, হতাশায় আত্মহত্যা করেছেন	-	৯১
অ্যালকোহলে আসক্তরা মদ না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন	-	৪৬
রাস্তায় ও রেললাইনে দুর্ঘটনায়	-	৮৯
লকডাউনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দাঙ্গায় (সাম্প্রদায়িক নয়)	-	১৪
অজানা কারণে (বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি)	-	৪৩

৩১ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানালেন – কোনো পরিযায়ী শ্রমিক রাস্তায় নেই। সবাইকে তারা থাকার এবং খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অথচ ৯মে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেল যার মধ্যে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ রেললাইনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল ১৬টি ক্লান্ত শরীর।

আমরা যারা দীর্ঘসময় শ্রমিকদের পাশে আছি তাদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে, তারা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে বিপুল অর্থ বিভিন্ন শ্রমিক প্রকল্পের মাধ্যমে মজুদ আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার এই কঠিন সময়েই হওয়া উচিত ছিল। প্রভিডেন্ড ফান্ডের কয়েক লাখ কোটি টাকা, ই এস আই-তেও শ্রমিকদের কাছ থেকে নেওয়া লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা পড়ে আছে। এছাড়াও নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলে প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা কেন্দ্রীয় তহবিলে জমে থাকা এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোনো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের প্রদেয় অর্থ নয় – সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া অথবা সেস বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বাবদ জমা থাকা এই অর্থ যদি আজকের এই দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করতেন তবে এদের এতো কষ্ট, লাঞ্ছনা, মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যেত।

সাধারণ নাগরিক সমাজের শ্রমিকদের সম্পর্কে জানা-বোঝা বেশ কম। যেটুকু চর্চা আছে তা শিল্প-শ্রমিক-অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে। তাই সেভাবে সমাজের মূল ধারায় এই আলোচনা আজও অনুপস্থিত। ই এস আই-এর আইনেই আছে কারখানা/সংস্থা কোনো কারণে বন্ধ হলে শ্রমিকদের বেতনের নির্দিষ্ট অংশ অনুদান হিসেবে পাবার অধিকারী তারা। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এই আইনের সাহায্য নিতে পারতেন সামান্য কিছু রদবদল করেই। তা না করে সরকার আবেদন করেছেন শিল্পমালিক ও সংস্থার কাছে যে এই বন্ধ থাকাকালীন সময়ে শ্রমিকদের যেন বেতন দেওয়া হয়। একাধিক জুটমিল ইতিমধ্যেই নোটিশ দিয়েছে যে কোভিড ১৯ লকডাউন সময়ের বেতন তারা দেবে না।

এখন প্রশ্ন হ'ল, সরকার কীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? কোন আইনে, কিসের ভিত্তিতে এই নির্দেশ? ফ্যাক্টরি আইনে/শ্রম আইনে 'লকডাউন' সময়কালকে কী ধরা হবে – লে-অফ/লক আউট/ক্লোজার/সাস্‌পেনশন অফ প্রোডাকশন, নাকি সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক – এর কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা কোথাও-ই নেই।

ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৭ শতাংশই ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প। এইসব শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারিদের সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। সেখানে এমনিতেই কোভিড আক্রান্ত ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ' ধরণের ঢালাও আবেদনের না আছে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা, না আছে কোনো বাস্তব যৌক্তিকতা।

ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য এদেশে Interstate Migrant Act নামক একটি আইন আছে যাতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যত শ্রমিক কাজ করতে যান তাদের নাম রেজিস্ট্রি করাতে হয়। কার মাধ্যমে গেছেন (Placement Agency বা Registered Contractor) তা-ও জানানো প্রয়োজন। কিন্তু এখন দেখা গেল রাজ্যে-রাজ্যে এর যৎসামান্যই নথিবদ্ধ রয়েছে। ভারতে 'বন্ধুয়া মজদুর' (Bonded labour) ব্যবস্থা বেআইনি, কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টি সামনে আসতেই জানা গেল বন্ধুয়া মজদুর প্রথা বা দাস ব্যবস্থার মতো বেআইনি কারবার বহাল তবিয়তেই এখনো চলছে!

ইকনমিক সার্ভে২০১৬-১৭তে বলা হয়েছে ভারতে দরিদ্র রাজ্যগুলি যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল রাজ্যে যেমন দিল্লী, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় গেছেন। দেশের আর্থিক সমীক্ষার প্রতিবেদনের তথ্য পুরোপুরি মানা যায় না– যেমন দেখা গেছে মহারাষ্ট্রের কিছু জেলা থেকেও শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে কাজের জন্য গেছেন। আসলে পণ্য, পুঁজি ও শ্রম– এই তিনের অবাধ চলাচল হয় চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব মেনেই। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদতার কারণেই সবসময়ে এই স্থানান্তর– তা নাও হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ভিন রাজ্যে যান বিভিন্ন পেশার দক্ষ শ্রমিকরা। ছুতোরের কাজ করতে যান বেশ কিছু মানুষ, সোনা-রূপোর কাজ করতে গুজরাটে যান, জরির কাজে দক্ষ হাওড়ার পাঁচলা অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ দিল্লী যান, নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণাটকে কাজ করতে যান অনেকে। এছাড়া গৃহশ্রমিক হিসেবে বহু মহিলাও অন্য শহরে যান। উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ শিল্পে বাংলার বহু শ্রমিক আছেন। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার, বীরভূম, হাওড়া থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। এদের মধ্যে ৬০-৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা রমজানে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন এবং বাকি সময়টা কাজের জায়গায় থাকেন। বেঙ্গালুরু শহরে বর্জ্য (waste) আলাদা করার কাজ করেন যে ১৪ হাজার শ্রমিক তারা মূলতঃ বাংলার। কাশ্মীরে রয়েছেন রাজ্যের প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক। মালদহ-মুর্শিদাবাদের নির্মাণ শ্রমিক বা রাজমিস্ত্রিদের দক্ষতার কদর আছে সারা দেশেই। কেরালায় কাজ করেন বাংলার প্রায় ৬ লাখ শ্রমিক।

২০১১ সালের সেনসাস অনুযায়ী সারা দেশে পরিযায়ী শ্রমিক সংখ্যা ৩.৫ কোটি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতে ২০২০ সালে তা কম করেও ১৫ কোটি তো হবেই – সারা বিশ্বে কোথাওই যার নজির নেই। সরকারিভাবে এদের বলা হয় Informal labour। গোটা ভারতে নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন ৫ কোটি ২০ লাখের মতো, যাদের অধিকাংশই পরিযায়ী (NSSSO - এর মতে)। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক যেমন রয়েছেন, তেমনই একই রাজ্যের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় (Inter District) গিয়ে কাজ করেন বহু মানুষ কিন্তু এসব কোনোকিছুরই সঠিক তথ্য কোথাও নেই। অথচ পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে এসব নথিভুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে সরকারের। ঠিকাদার বা শ্রমিক কারো তরফেই এই নথিভুক্ত করার কাজটা ঠিকমতো হয় না।

ভারতে কেরালা একমাত্র ব্যতিক্রমী একটি রাজ্য যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকদের 'অতিথি শ্রমিক' (Guest Labour) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে একটি Smart Card দেওয়া হয় যার মাধ্যমে চিকিৎসা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুবিধা তারা পেয়ে থাকেন। প্রকল্পটির নাম 'আওয়াজ'। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র প্রত্যেকটি কাজের জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই সুবিধা শ্রমিকদের দিয়ে থাকে। এছাড়া 'আপনা ঘর' নামে একটি স্কীম ২০০৭ সালে চালু করা হয়েছে যাতে ৯৬০টির মত ঘর করা হয়েছে এই শ্রমিকদের থাকার জন্য।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলার শিল্পায়নের একেবারে গোড়ার যুগে বিভিন্ন কারখানা/জুটমিলে কাজ করতে আসা শ্রমিকরা দমবন্ধ পরিবেশে অস্বাভাবিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে দলে দলে ফিরে গিয়েছিলেন নিজেদের গ্রামে। ফলশ্রুতিতে 'ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট' এর জন্ম যাতে ইংরেজ শাসকরা বাধ্য হল শ্রমিকদের কাজের সুস্থ পরিবেশ, নিরাপত্তা, সীমাবদ্ধ অধিকার দিতে। দেড়শো বছর পেরিয়ে এসে একই রকম ভাবে শ্রমিকদের কর্মস্থল থেকে গৃহে প্রত্যাগমনের এই চেহারা আজকের সময়ে প্রত্যাশিত ছিল না। আজও নিজের দেশের সরকারের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র আংশিক রেশনেই সীমাবদ্ধ থাকল, তাও আবার সবার কাছে পৌঁছল না।

ভারতে মোট শ্রমের ২৭ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিক। শ'য়ে শ'য়ে মাইল জুড়ে ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে জর্জ্জরিত শ্রমিক পরিবারের কোলে-কাঁধে শিশু নিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নদী-নালা পেরিয়ে নিজের গ্রামে ফেরার অমানবিক এই প্রচেষ্টা – আমরা শুধু দেখছি আর অসম্ভব একটা কষ্ট অনুভব করছি, অপরাধবোধে ভুগছি আর ভাবছি বরাতজোরে পরিযায়ী শ্রমিক হইনি, বেঁচে গেছি, নাহলে আমার পরিবারকেও এসব নারকীয় দুর্দশায় পড়তে হত।

স্বাধীনতার পর থেকে এ'দেশের নাগরিকদের যে কটি কঠিন সময় পেরোতে হয়েছে : এক - জরুরী অবস্থা, দুই - বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা, তিন - নোটবন্দী আর চার - লকডাউনে নিজেদের ঘরে ফিরতে চাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অবিরাম পথচলা, মৃত্যুমিছিল –যা নাগরিক মননকে একেবারে গোড়া ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের সামনে দু'টো দেশ ছিল। কিন্তু আমাদের বোধের মধ্যে এটা ছিল না যে এ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে পরিযায়ী হয়ে, অ-নাগরিক হয়ে বেঁচে আছে।

কলকাতা, ২৫ মে, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com